সদাচার ও ধর্ম জীবনের প্রেরণাদাত্রী ব্রহ্মচারিণী তারারাণী দেবী

গুরুঃ বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎতারকং ব্রহ্মনিশ্চিতম্।
তীর্থরাজঃ প্রয়াগোহসৌ গুরুমূর্ত্যৈ নমোনমঃ।।

ব্রহ্মচারিণী তারারাণী দেবী (চক্রবর্ত্তী) ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট থানার অন্তর্গত হোটর মর্য্যাদা গ্রাম সহ আশেপাশের বহুগ্রামের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়জন। তিনি হোটরস্থিত মর্য্যাদা গ্রামের ''সারদা রামকৃষ্ণ শিশু ও মহিলা সেবাশ্রমের'' প্রতিষ্ঠাত্রী এবং প্রথম সম্পাদিকা ছিলেন। ইং ২০০৫ সাল থেকে তিনি আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীমা সহ অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমের গুরুভাই বোনদের কাছেও অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় প্রিয়জন ছিলেন তিনি।

ধর্মনিষ্ঠ পিতা শ্রীসুধীর কুমার চক্রবর্ত্তীর তিন কন্যার মধ্যমা কন্যা ছিলেন তিনি। যজন-যাজন বৃত্তিতে চলত তাঁর দরিদ্র পিতার সংসার। সংসারের এমত দরিদ্র অবস্থাতেও তিনি কিছু মানুষের সহযোগীতা ও আর্থিক সাহায্যে তৎকালীন সমাজে বি.এ. পাশ করে স্কুলে চাকরী করতেন। একই সাথে তাঁর ব্রাহ্মণ পিতার কাছে লালিত পালিত হয়েছিলেন শ্রীজগদীশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় একপ্রকার দৈব নির্দেশে। তিন বোন এবং দাদা, বড় ভাই এর মত এক সাথে বড় হয়েছেন। এই দাদাও তখন জি.পি.ও তে চাকরী করতেন। বেলুড় মঠের স্বামী মাধবানন্দজীর কাছে দীক্ষিত ছিলেন তিনি। তাঁরই (দাদার) প্রেরণা ও উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আদর্শে দীন, দরিদ্র, অনাথ, আতুরের সেবাব্রত গ্রহণ করে একটি মহিলা সংগঠন তৈরী হয় ব্রহ্মচারিণী তারারাণী দেবীকে (তারাদি) কেন্দ্র করে। পরবর্তীকালে এই তারাদিই হলেন আশ্রমের সকলের 'বড়মা'— ''সারদা রামকৃষ্ণ শিশু ও মহিলা সেবাশ্রমের'' মূল কর্ণধার।

শ্রীশ্রীমা ও বহ্মচারিণী তারারাণী দেবী

নিরহংকারিতা, প্রতিটি মানুষকে ভালবাসা, সদা সন্তুষ্টিভাব, ঈশ্বর নির্ভরতা এবং ঈশ্বর প্রীতি ছিল তাঁর বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই মানুষটির কাছে অনেকেই আমরা স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম। ১৯৯৭ সাল থেকে আমি তাঁর আশ্রমের সাথে যুক্ত ছিলাম, এবং পরে তাঁরই হাত ধরে ২০০৬ সালে ১লা অক্টোবরে আমি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসি। বড়মা ছিলেন নারীজাতীর আদর্শ ও প্রেমের প্রতিমূর্তি। ঐরকম একটা প্রত্যন্ত অজ পাড়াগ্রামে বাস করে নিজে উচ্চশিক্ষালাভ করেছিলেন এবং তৎকালীন সমাজের গ্রামীণ মহিলাদেরও উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন। আশেপাশের মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্যতা ও চিকিৎসার অভাবে মানুষের অকাল মৃত্যু, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, আধ্যাত্মিকতার অভাব তাঁর প্রাণকে করে তুলতো বিচলিত।

সংগঠনের প্রথমদিকে দাদা ও বড়মা চাকরী করতেন। পরে সামাজিক কাজের জন্য প্রচুর সময় দিতে হয়। তাছাড়া মেয়েদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পাঠচক্র (সপ্তাহে একদিন, দুদিন কিম্বা প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে সৎগ্রন্থ পাঠ) করতে গিয়ে সেবা ব্রত নিয়ে দুজনেই চাকরী ছাড়লেন। চাকরী ছাড়ার পর প্রচণ্ড দারিদ্র্যতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে একবেলা খেয়ে আর এক বেলা ৫০ গ্রাম মুড়ি ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে সেই প্রসাদ একমুঠো করে খেয়ে জল খেয়ে রাতের খাওয়া শেষ করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে গ্রামের কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহযোগীতায় কিছু আগ্রহী মেয়েদের নিয়ে তাঁর পিতৃ ভিটাতেই ১৯৬৮ সালে সংগঠন গড়ে তোলেন, ঐ সংগঠনটির নাম হয় ''সারদা-রামকৃষ্ণ শিশু ও মহিলা সেবাশ্রম। এখানে মূলতঃ অনাথ ৩ বছর থেকে ১৮ বছর বয়সের শিশু ও মহিলা প্রতিপালিত হয়। বর্তমানে ঐ আশ্রমে প্রত্যহ প্রায় ১৭৫ - ২০০ জন প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বর্তমান সমাজে অধিকাংশই আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থচিন্তায় মগ্ন মানুষের অন্য মানুষের কথা ভাবা, তাদের সুখে দুঃখের সঙ্গী হয়ে কুসংস্কার মুক্ত করে তাদের সুন্দর সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের পথ দেখানোর কথা ভাবা, এমন উদার মনভাবাপন্ন মানুষ

হাজার কেন লক্ষেও একজন আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের শ্রীশ্রীমা তো 'সত্য জননী' — তাঁকে ছাড়া বড়মার মত সত্যনিষ্ঠ কর্মযোগী, নিষ্কাম, সদা সন্তুষ্টচিত্তা, জনকল্যাণকামী দরদী মানবী চরিত্রের মানুষ এ যুগে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্তমানকালের হানাহানিতে ভরা সামাজিক পরিস্থিতিতে তাঁর মত একজন সত্যিকারের জনদরদী মানুষকে হারিয়ে আমরা খুবই মর্মাহত।

গত কয়েক বছর ধরে আশ্রমের ভবিষ্যত প্রজন্ম তৈরী নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন বড়মা। ২০০৫ সালে তিনি সংকল্প করলেন কয়েকজন মেয়েকে ব্রহ্মচর্য্য দেওয়াবেন শ্রীশ্রীগৌরীমার শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম থেকে বন্দনা পুরী মায়ের কাছে। এক বছরের মধ্যে মেয়েদের মন ঠিক করতে বলা হয়। ২০০৫ এর দুর্গাপূজা থেকে ২০০৬ সালের দুর্গাপূজা পর্যন্ত — সংকল্পের সময়। এই সময় পেরিয়ে গেলে সংকল্প ভ্রষ্ট হবেন। ব্যাকুলভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা চলছে — এদিকে দেখতে দেখতে ২০০৬ এর দুর্গাপূজা আগতপ্রায়; বন্দনাপুরীমা (আমার পূর্ব গুরুমা) খুবই অসুস্থ; তিনি ব্রহ্মচর্য্য দিতে পারবেন না। কি হবে? তবে কি সংকল্প ভ্রষ্ট হবেন! 'মা' কি কৃপা করবেন না! ঠাকুরের ও মায়ের কাছে খুবই কান্নাকাটি করছেন বড়মা। অবশেষে মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ীরূপের কাছে পৌঁছালো তাঁর সন্তানের ব্যাকুল ডাক। মাতা বন্দনাপুরীর নিকট শুনলেন বড়মা অখণ্ড মহাপীঠের শ্রীশ্রীমায়ের কথা। অর্থাৎ চিন্ময়ীরূপে ভগবতী স্বয়ং ডেকে নিলেন তাঁর সন্তানদের; শ্রীশ্রীমা নিজ হস্তে প্রদান করলেন ব্রহ্মচর্য্য। রক্ষা করলেন ভক্তের সংকল্প। ইং ২০০৬ সালের ঁশ্রীশ্রীদুর্গানবমী তিথিতে চার জনকে ব্রহ্মচর্য্য দান করলেন এবং ইং ২০০৭ সালে দুজনকে সন্ন্যাস প্রদান করলেন। বড়মা চিন্তা মুক্ত হলেন; কারণ স্বয়ং যে মাকে তিনি এতদিন প্রার্থনায় ও ধ্যানে আকুল হয়ে ডেকেছেন, তিনি নিজেই তাঁর আশ্রমের ভার গ্রহণ করে বড়মা সহ আরও অনেককে যোগদীক্ষা প্রদান করে সেবাশ্রমের সকলকে আপন করে নিলেন। যে দুজনকে শ্রীশ্রীমা সন্ন্যাস প্রদান করেছেন তাঁরা হলেন, পূজা মা— সাধ্বী পুণ্যানন্দময়ী এবং সন্ধ্যাদি— সাধ্বী সূচেতানন্দময়ী। পরবর্তীতে শ্রীশ্রীমা আরও অনেককেই ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা প্রদান করেন।

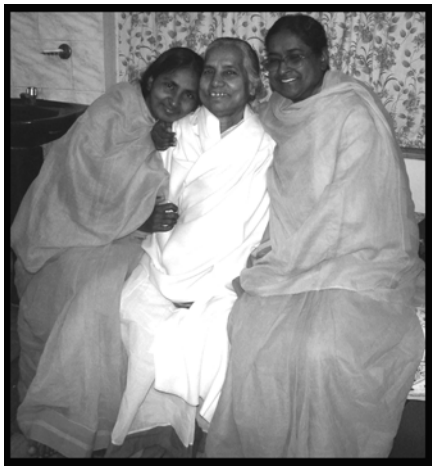

তারাদির সঙ্গে সাধ্বী পুণ্যানন্দময়ী (বাঁদিকে) এবং সূচেতানন্দময়ী (ডানদিকে)।

আমার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রেরণা ছিলেন বড়মা। যখন থেকে আমি আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি তখন থেকেই তিনি দীক্ষা নিতে বলেন। সমাজ-সেবামূলক কর্মোপলক্ষে আমি আশ্রমে আসি, তাই স্বাভাবিক ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা মার মন্ত্রে দীক্ষা নিতে আমার মন সায় দিল না, কারণ, ছোট বেলা থেকে জানতাম — কৃষ্ণ, শিব, কালী, দুর্গা এঁরাই ভগবান ভগবতী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে কালীমায়ের সাধক হিসাবে চিনতাম। দীক্ষা নিতে অরাজী হওয়ায় বড়মা আমাকে নিত্য পাঠের সময় বই পড়ার দায়িত্ব দিলেন। এরপর প্রত্যহ বিকেল ৪টের সময় ঠাকুর-বারান্দায় বসে দাদা, বড়মা কখনো সন্ধ্যাদি ও আরও অনেকের উপস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করতে লাগলাম। পাঠ করতে করতে জানতে পারলাম ঠাকুরই স্বয়ং ভগবান। শিব, কৃষ্ণ, কালী, রাম সকলের মিলিত রূপ। তিনি অবতার বরিষ্ঠ। তাঁকে ক্রমশঃ ভালবাসতে লাগলাম ঠাকুর ও মা অভিন্ন। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আদর্শকে আমার খুব ভাল লাগল, একদিন বড়মাকে নিজে গিয়ে বল্‌লাম বড়মা আমি দীক্ষা নেব। দীক্ষাও হয়ে গেল, নিত্য কাজ জপ ধ্যানের দিকে নজর রাখতেন তিনি। কিভাবে ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডাকতে হয় তা দেখেছি দাদা ও বড়মার জীবনে। কোন সময় হয়ত বড়মা নিজে পাঠ করছেন, দেখতাম পাঠের মাঝে যেখানে গান আছে নিজেই সুর দিয়ে, কখনো চেনা সুরে দাদা ব্যাকুল হয়ে গান গেয়ে চলেছেন দাদার চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে বড়মাও পাঠ বন্ধ করে সজল নয়নে দাদার দিকে তাকিয়ে আছেন। এই প্রসঙ্গে বলি, একদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর একজন ভক্ত গান গাইছে- ''আমার কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার'' গানটি শুনে বড়মা কেঁদে

কেঁদে বললেন — ''স্বামীজী এই গানটা গাইছেন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের ঐ ঘরে ছোট খাটটাতে বসে, স্বামীজী ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে গান গাইছেন আর ডুকরিপিটে কাঁদছেন'' — এই কথা বলতে বলতে তিনি নিজেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। এই একবারই বড়মাকে প্রকাশ্যে কাঁদতে দেখেছি আমি। এমনিতে তিনি খুব চাপা স্বভাবের ছিলেন। এঁদের কাছেই শিখেছি ভগবানকে নিষ্কামভাবে কেমন করে প্রার্থনা করতে হয়।

ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে সর্বকর্মকে ভগবানের কর্ম বলে মনে করে নির্লিপ্ত ও নিষ্পৃহভাবে সম্পন্ন করে গেছেন বড়মা। তাঁকে কেউ কোনদিন খুব রেগে কথা বলতে দেখিনি। স্নেহ ভালবাসা দিয়ে তিনি আশ্রমের আভ্যন্তরীন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। প্রত্যেক রবিবার বড় মেয়েদের নিয়ে বসে কার কোন কাজে কি অসুবিধা - সুবিধা হচ্ছে আলোচনা করতেন। সমস্ত রুটিন নিজে উপস্থিত থেকে করাতেন মেয়েদের দিয়ে। বড় মেয়েরাও সুশৃঙ্খলভাবে তাদের নিজেদের কাজ করে যেত। তবে বাচ্চাগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা খুবই কষ্টকর ছিল।

বাচ্চারা যাতে আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন হয় তারজন্য ছোট্ট বয়স থেকে বিভিন্ন পূজা পাঠ করাতেন। নিজে ভাল ভাল বই পড়ে শোনাতেন ছুটির দিনে। পূজার কাজও করাতেন। তাদের উদ্দেশ্যে বড়মা বলতেন — ''ভগবান ছাড়া আপন জন কেউ নেই। ভালবাসবে সকলকে কিন্তু মনটি দেবে কেবল ঈশ্বরকে। তোমাকে সত্য ভালবাসে কেবল ঈশ্বর। সকলকে ভালবেসে বেঁচে থাকার জন্য সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছেন ভগবান। কিন্তু আমরা এমনই স্বার্থপর যে তাঁকেই আমরা ভুলে থাকি। এছাড়াও বিশেষ করে সমাজের অনাথ দুঃস্থদের, সমাজে যারা অবহেলিত, সেই নারীজাতিকে সংগঠিত করে সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন রকমের হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাতে তারা স্বনির্ভর হয়ে সুন্দর সাংসারিক জীবন যাপন করতে পারে সে সব কর্মের ব্যবস্থাপনার প্রতিও সজাগ দৃষ্টি ছিল বড়মার। আজ তিনি স্থূলতঃ আমাদের মধ্যে নেই। তিনি জীবিত রইলেন তাঁর ধর্ম প্রণোদিত সুকর্ম সৃষ্টির মধ্যে। আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই তাঁর আত্মা যেন চির শান্তিতে তাঁর ইষ্টদেবের চরণে বিরাজ করেন।

—মাতৃচরণাশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী শিপ্রা